শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ুচণ্ডীদাস নামক জনৈক মধ্যযুগীয় কবি রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা বিষয়ক একটি আখ্যানকাব্য। ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে অযত্নরক্ষিত অবস্থায় এই কাব্যের একটি পুথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ সালে তারই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে পুথিটি প্রকাশিত হয়; যদিও কারও কারও মতে মূল গ্রন্থটির নাম ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। বৌদ্ধ-সহজীয়া গ্রন্থ চর্যাপদের পর এটিই আদি-মধ্য বাংলা ভাষার প্রাচীনতম আবিষ্কৃত নিদর্শন।

পুঁথি পরিচিতি :

১) পুঁথিটি দুভাঁজ করা তুলোট কাগজে লেখা---উভয় পৃষ্ঠায় লেখা।

২)পুঁথিটি খণ্ডিত।এর প্রথম দুটি পাতা, মাঝের কিছু পাতা এবং ২২৬-এর পর আর কোনো পাতা মেলেনি।৩-৮, ১০-১৫,১৭/২, ১৮, ১৯/২, ২০-৪০, ৪২-৮৭, ৮৮/১, ৮৯-৯২, ৯৩/১, ৯৪-৯৭, ৯৮/২, ৯৯-১০৩, ১১২-১৪৪, ১৫২-২২৬ পুঁথিটিতে এই পাতাগুলি আছে।আর যে পত্র/পৃষ্ঠাগুলি নেই সেগুলি হলো----১, ২,৯,১৬, ১৭/১, ১৯/১, ৪১, ৮৮/২, ৯৩/২, ৯৮/১, ১০৪-১১১, ১৪৫-১৫১।

৩)প্রতিটি পৃষ্ঠায় সাধারণত ৭ টি করে লাইন।তবে ৩-১৫ পর্যন্ত, এই ১৩ টি পত্রে ৮ টি করে লাইন।

৪)পুঁথিটিতে মোট বাংলা গান বা পদ আছে---৪১৮টি। সংস্কৃত শ্লোক আছে ১৬১ টি।

খন্ড বিভাগ :

বড়ুচন্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যান কাব্য।প্রথম কাহিনী-কবিতা।এই কাহিনীটি মোট ১৩ খন্ডে বিভক্ত- ১)জন্মখন্ড, ২)তাম্বুলখন্ড, ৩)দানখন্ড, ৪)নৌকাখন্ড, ৫)ভারখন্ড, ৬)ছত্রখণ্ড, ৭)বৃন্দাবনখন্ড, ৮)কালীয়াদমনখন্ড, ৯) বস্ত্রহরণখন্ড(যমুনাখন্ড), ১০)হারখন্ড, ১১)বাণখণ্ড, ১২)বংশীখন্ড ও ১৩)রাধাবিরহ।

কোন খণ্ডে কত পদ :

জন্মখণ্ড > ৯

তাম্বুল খণ্ড > ২৬

দানখণ্ড > ১১২

নৌকা খণ্ড > ৩০

ভারখণ্ড > ২৮

ছত্রখণ্ড > ৯

বৃন্দাবনখণ্ড > ৩০

কালীয়দমন খণ্ড >১০

বস্ত্রহরণখণ্ড/যমুনাখন্ড > ২২

হারখণ্ড > ৫

বাণখণ্ড > ২৭

বংশীখণ্ড > ৪১

রাধাবিরহ > ৬৯

খণ্ডগুলির পরিচিত :

জন্মখন্ড :

এটি খন্ডিত খন্ড

১) অথ জন্মখন্ড দিয়ে শুরু।

২) মোট কবিতা বা পদ--৯

৩) সংস্কৃত শ্লোক--৩

৪) রাগরাগিণী --৫

৫) এই খন্ডে কৃষ্ণ ও হলধর(বলরাম) এর জন্মের কথা রয়েছে।

৬) কৃষ্ণ:--

রোহিনী নক্ষত্রে অষ্ঠমী তিথিতে এক অন্ধকার বর্ষার রাতে জন্ম।সেই রাতে পিতা বসুদেব গোকুলে যশোদার কাছে রেখে আসে।

কৃষ্ণের পরনে পীতবস্ত্র ও হাতে বাঁশী,বত্রিশ রাজলক্ষণযুক্ত।

৭)#রাধা:--

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার মা পদুমা বা পদ্মা,পিতা সাগর।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে "--- মা কলাবতী,পিতা--বৃষভানু।

পদ্মাপুরাণে :---মা কীর্তিদা, পিতা বৃষভানু।

তাম্বুলখন্ড :

১) খন্ডিত খন্ড।

২) মোট পদ---২৬ টি।

৩) সংস্কৃত শ্লোক--৭ টি।

৪) রাগরাগিণী ---১০ টি।

৫) এখানে পাহাড়ীআ রাগের পদ বেশী।

৬) এই খন্ডে রাধা বড়ায়ির কাছ থেকে হারিয়ে যায়।

৭) এই খন্ডে রাধার নাম চন্দ্রাবলী পাওয়া যায়।

৮) এই খন্ডে প্রথম যমুনা নদীর নাম পাওয়া যায়।

৯) এই খন্ডে বড়ায়ির হাতে কৃষ্ণ কর্পূরবাসিত তাম্বুল ও চাঁপা নাগেশ্বর ফুল পাঠায়।

১০) এই খন্ডে রাধা বড়ায়িকে চড় মেরেছে।

১১) এই খন্ডে কৃষ্ণ ও বড়ায়ির মধ্যে কথা হয়েছিল যে কৃষ্ণ মহাদানী হয়ে কদমের তলে যমুনার তীরে বসে থাকবে।

দানখন্ড :

এটি কাব্যের তৃতীয় খন্ড।

১) এটি খন্ডিত খন্ড।

২) এই খন্ডে সবচেয়ে বেশি পদ রয়েছে।

৩) মোট পদ--১১৩ টি।

৪) সংস্কৃত শ্লোক--৪৩ টি।

৫) রাগরাগিণী ---২০ টি।

৬) এই খন্ডে কৃষ্ণ মাহাদানী রূপে

ষোল পন দাবী করে রাধার কাছে।

৭) এই খন্ডেই প্রথম রাধার বয়স ১১ বছর বলা হয়েছে।

৮) এই খন্ডে রাধার কাছে কৃষ্ণের

নয় লক্ষ কড়ি এবং বারো বছরের মহাদান বাকী আছে বলেছে।

৯) এই খন্ডে কৃষ্ণ নিজেকে

অসুরবিনাশী কালীয়দমনকারী শ্রীকৃষ্ণ রূপে পরিচায়িত করেছে।

১০) এই খন্ডে রাধা কৃষ্ণকে মামা-ভাগ্নীর কথা বললেও প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের জন্য দুই কোটি মুদ্রা দান চেয়ে বসে কৃষ্ণ।

১১) এই খন্ডেই প্রথম নিরুপায় রাধা বৃন্দাবনের মাঝে মিলন কৃষ্ণের সাথে মিলন ঘটায়।

নৌকাখন্ড :

এটি কাব্যের চতুর্থ খন্ড।

১) এটা প্রথম সম্পূর্ণ খন্ড।

২) মোট পদ--৩০ টি।

৩) সংস্কৃত শ্লোক--১৩ টি।

৪) রাগরাগিণী --১১ টি।

৫) এই খন্ডে কৃষ্ণ ঘাটোয়াল সেজে রাধার কাছে সাতেসরী হার,সরস বচন,এবং আলিঙ্গন চেয়েছে।

৬) এই খন্ডে রাধার শাশুড়ির অনুমতি নিয়ে ষোলোশো গোপিনীর সঙ্গে মথুরার হাটে গেছে।

৭) শেষ পর্যন্ত এই খন্ডে রাধা কৃষ্ণকে দ্বিতীয় বার দেহদান করে।

৮) এই খন্ডেই প্রথম রাধার মনে মদন জাগে।

৯) এই খন্ডে কৃষ্ণ রাধাকে যমুনা নদীতে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছে একথা বড়ায়ির কাছে স্বীকার করেছে।

ভারখন্ড :

এটি কাব্যের পঞ্চম খন্ড।

১) এটি খন্ডিত খন্ড।

২) মোট পদ--২৮/২৯ টি।

৩) সংস্কৃত শ্লোক--১১ টি।

৪) রাগরাগিণী --১৬ টি।

৫) এই খন্ডে চামড় গাছের ডাল কাটার কথা আছে।

৬) এই খন্ডে প্রথম শরৎকালের কথা আছে।

৭) এই খন্ডে কৃষ্ণ মজুরিয়া সেজেছে।

৮) এই খন্ডে কৃষ্ণকে রতি দেবে বলে রাধা সমস্ত ভার বহন করিয়েছে।

৯) এই খন্ডে রাধা যমুনা নদী ভালোভাবে পার হতে পেরেছে।

১০) একটি বিশেষ লাইন-"উলটি উলটি রাধা কাহ্নপানে চাহে"।

ছত্রখন্ড :

এটি কাব্যের ষষ্ঠ খন্ড।

১) খন্ডটি খন্ডিত।

২) মোট কবিতা বা পদ--৯ টি।

৩) সংস্কৃত শ্লোক--৬ টি

৪) রাগরাগিণী --৮ টি।

৪) খন্ডটি শুরু-- অথ ভারখন্ডান্তর্গত ছত্রখন্ড:'

৫) এই খন্ডটি হাট থেকে বাড়ি ফিরবার ঘটনা।

৬) এই খন্ডে রাধা-কৃষ্ণের তর্কাতর্কি হয়েছে।

৭) এই খন্ডে কৃষ্ণ রাধার মাথায় ছাতা ধরলে তাকে কুঞ্জবনে সুরতি দেবে বলেছে।..... কিন্তু খন্ডিত বলে রতি দিয়েছিল কিনা জানা যায় নি।

বৃন্দাবন খন্ড :

এটি কাব্যের সপ্তম খন্ড।

১) এটিও খন্ডিত খন্ড।

২) মোট পদ--৩০ টি।

৩) সংস্কৃত শ্লোক--১১ টি।

৪) রাগরাগিণী --১১ টি।

৫) এই খন্ডে রাধার ব্রতের ফুল তুলবার জন্য বৃন্দাবন যাওয়ার কথা আছে।

৬) এই খন্ডে কালিন্দীর তীরে ধীর বায়ু বইছে উল্লেখ আছে।

৭) এই খন্ডে কৃষ্ণ ষোলোশো গোপীকে তুষ্ট করতে বহুমূর্তি হয়ে তাদের বিলাস করিয়েছে।

৮) এই খন্ডে কৃষ্ণ রাধার চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করার কথা আছে।

৯) এইখানে চুম্বকোল কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

১০) এই খন্ডেই তৃতীয় বার প্রথম দুই জনের ইচ্ছাতেই মিলন হয়েছে।

১১) এই খন্ডের অনেক কবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক পদের মিল দপখা যায়।

১২) এই খন্ডে জয়দেবেরর প্রভাব আছে।

কালীয়দমন খন্ড :

কবি প্রদত্ত নাম--যমুনাখন্ডান্তর্গত কালীয়দমন খন্ড।

১) এই খন্ডটি সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে।

২) সম্পূর্ণের দিক থেকে দ্বিতীয় খন্ড।

৩) মোট পদ--১০ টি।

৪) সংস্কৃত শ্লোক--২ টি।

৫) রাগরাগিণী --৭ টি।

৬) এই খন্ডে বৃন্দাবনে যমুনানদীতে কালীদহ নামে একটা গভীর হ্রদের কথা আছে।

৭) এই হ্রদে কালীয় নামে একটি সাপ আছে। এবং কালীয়নাগ ও তার সর্পকুল কৃষ্ণকে দংশন করেছিল এবং কৃষ্ণ জ্ঞান হারিয়েছিল।বলভদ্র কৃষ্ণের জ্ঞান আওড়ালেন।

৮) এখানে নন্দ-যশোদার উল্লেখ আছে।

৯) এই খন্ডে কালীয়নাগদের সপরিবারে দক্ষিন সাগরে পাঠানোর কথা আছে।

১০) কালীয়দমন খন্ডের প্রধান ঘটনা কালীয়নাগ দমন।

বস্ত্রহরণ খন্ড/যমুনাখন্ড :

এটি কাব্যের নবম খন্ড।

১) প্রাপ্ত পুঁথিতে এই খন্ডের কোনো নাম পাওয়া যায় নি। সম্পাদক নিজে বিবেচনা করে নাম দিয়েছেন যমুনাখন্ড।

২) কোনো কোনো গবেষক এর নাম দিয়েছেন--যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণ খন্ড।

তাঁদের মতে কালীয়দমন খন্ড,বস্ত্রহরণ খন্ড ও হার খন্ড মিলিয়ে সম্পূর্ণ যমুনা খন্ড। কারণ এই তিনটি খন্ডের বিষয়বস্তুই যমুনার পটভূমিতে সৃষ্ট।

৩) এটি সম্পূর্ণ খন্ড।সম্পূর্ণের দিক থেকে এটি তৃতীয় খন্ড।

৪) মোট বাংলা কবিতা--২২ টি।

৫) সংস্কৃত শ্লোক--১১ টি।

৬) রাগরাগিণী --১১ টি।

৭) কাব্যটি শুরু--'অথ যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণ খন্ড'।

৮) এই খন্ডে কৃষ্ণ রাধাকে সোনার কিঙ্কিনী,দীর্ঘ পট্টবস্ত্র, রতন খচিত মাথার মুকুট ইত্যাদির প্রলোভন দেখিয়েছিল।

৯) এই খন্ডে রাধাকে কাছে ডেকে তার গালে একটা চুম্বন দিয়ে বসে।

১০) এই খন্ডে কৃষ্ণ পদ্মাবনে লুকিয়ে পড়েছিল।

১১) এই খন্ডে পরের দিন ভোরে কৃষ্ণ যমুনা তীরে কদম গাছে উঠে বসে ছিল।

১২) এই খন্ডে কৃষ্ণ রাধা ও গোপীদের বস্ত্রগুলি নিয়েছিল।

১৩) এই খন্ডে শেষপর্যন্ত রাধা অর্ধজলমগ্ন অবস্থায় ডানহাতে বুক ঢাকা দিয়ে ডাঙায় উঠে হাত জোড় করলে কৃষ্ণ বস্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছিল কিন্তু #হারটি দেয় নি।

১৪) বৈষ্ণব সমাজে এই খন্ডটি সাড়া ফেলেছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেব বস্ত্রহরণ খন্ড অভিনয় করেছিলেন।

১৫) এখানে যে হারটির কথা বলা হয়েছে তা হল রাধার গলার গজমতি হার।

হার খন্ড :

এটি কাব্যের দশম খন্ড।

১) এটি খন্ডিত খন্ড।

২) খন্ডের প্রথমেই পুঁথিতে আছে যমুনান্তর্গত হারখন্ড। কিন্তু শেষে নাম আছে ইতি যমুনাখন্ড।

৩) মোট কবিতা-- ৫ টি।

৪) সংস্কৃত শ্লোক--৩ টি।

৫) রাগরাগিণী --৩ টি।

৬) এখানে কৃষ্ণের নামে যশোদার কাছে অভিযোগ করলে কৃষ্ণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

৭) এখানে বড়ায়ি আইহনকে রাধার হার হারানোর কথা বলেছেন।

৮) এখানে দামাল বলদের কথা উল্লেখ আছে।

বাণখন্ড :

এটি কাব্যের একাদশ খন্ড।

১) এটি সম্পূর্ণ খন্ড। সম্পূর্ণের দিক থেকে চতুর্থ।

২) মোট কবিতা--২৭ টি।

৩) সংস্কৃত শ্লোক--৮ টি।

৪) রাগরাগিণী --১৪ টি।

৫) এই খন্ডে বড়ায়ি কৃষ্ণকে বলেছে যে তুমি রাধাকে পুষ্পবাণ মারো। পাঁচ বাণে তার প্রাণ নাও।

৬) এই খন্ডে রাধা বড়ায়ির পায়ে ধরে নিজেকে রক্ষার জন্য লক্ষমুদ্রার আংটি উপহার দিতে চেয়েছিল।

৭) এই খন্ডে রাধার বুকে বাণ মেরেছিল।

৮) এখানে তালপাতার পাখার বাতাসের কথা আছে।

৯) এই খন্ডে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে লুকিয়ে পড়ে এবং পরে কুঞ্জবনে দেখা পেলে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হয়।

১০) এই খন্ডেই প্রথম বড়ায়ি কৃষ্ণকে দোষারোপ করে।

বংশীখন্ড :

০) এটি কাব্যের দ্বাদশ খন্ড।

১) এটি সম্পূর্ণ খন্ড।সম্পূর্ণের দিক থেকে পঞ্চম।

২) সম্পূর্ণ হলেও ৬নং কবিতার আটটি অক্ষর পড়া যায় নি।

৩) মোট কবিতা--৪১ টি।

৪) সংস্কৃত শ্লোক--১৯ টি।

৫) রাগরাগিণী --১৬ টি।

৬) এই খন্ডে কৃষ্ণ মোহন বাঁশী নির্মান করে।তাতে সাতটি সুন্দর ছিদ্র, তা সোনার সামি লাগানো ও হীরের কারুকার্য যুক্ত।

৭) এখানে বসন্তের কথা উল্লেখ আছে।

৮) এই খন্ডে রাধা বড়ায়ির কাছে কৃষ্ণকে আনার প্রার্থনা করেছে।

৯) এই খন্ডে বড়ায়ির নির্দেশে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করে কলসীতে ভরে বাড়ি নিয়ে গেছে।

১০) এই খন্ডে কৃষ্ণকে নিদ্রাচ্ছন্ন করেছিল বড়ায়ি।

১১) এখানে বাঁশী চুরির উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে রাধাকে যেভাবে আকুল করেছিল তা থেকে রক্ষা পাওয়া।

রাধাবিরহ :

০) এটি কাব্যের তেরোতম ও শেষ খন্ড।

১) পুঁথিতে খন্ড নামটি নেই, পুঁথিতে আছে অথ রাধাবিরহ।

২) মোট কবিতা--৬৯ টি।

৩) সংস্কৃত শ্লোক--১৭ টি।

৪) রাগরাগিণী --২৩ টি।

৫) এই খন্ডে চৈত্র মাসের কথা আছে।কোকিলের ডাক।

৬) এই খন্ডে রাধা একরাত্রে কৃষ্ণ মিলনের স্বপ্ন দেখেছিল।

৭) এই খন্ডে রাধা যোগিনী বেশে দেশত্যাগী হতে চেয়েছে।

৮) রাধা বড়ায়িকে কৃষ্ণের সন্ধানে শতপল সোনা,কর্পূর বাসিত পান সুপুরি নিয়ে যেতে বলে।

৯) এই খন্ডে রাধা বৃন্দাবনের কদমতলায় মোহিনী বেশ ধারণ করেছে।

১০) এই খন্ডে রাধা কৃষ্ণের কাছে পূর্বের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

১১) এই খন্ডে কৃষ্ণ শর্ত দিয়েছিল যে রাধা মনোহর বেশে আসুক,মধুর সম্ভাষণ করুক তাহলে কৃষ্ণ তাকে সাদরে গ্রহণ করবে।

১২) এখানে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটেছে।

১৩) এখানেও বসন্তের উল্লেখ আছে।

১৪) এই খন্ডে কৃষ্ণ বলেছে-- আমি ধন-ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে পারি কিন্তু বাক্যজ্বালা সহ্য করতে পরি না।

১৫) এই খন্ডে রাধারই একমাত্র ভুমিকা এবং পুরোটায় তার কৃষ্ণকে হারিয়ে মর্মযন্ত্রনার কথা প্রকাশিত।

বৈশিষ্ট্য

ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে কৃষ্ণের জন্ম, বড়াইয়ের সহযোগিতায় বৃন্দাবনে রাধার সঙ্গে তার প্রণয় এবং অন্তে বৃন্দাবন ও রাধা উভয়কে ত্যাগ করে কৃষ্ণের চিরতরে মথুরায় অভিপ্রয়াণ – এই হল ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের মূল উপজীব্য। আখ্যায়িকাটি মোট ১৩ খণ্ডে বিভক্ত। জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড ইত্যাদি ১২টি অংশ 'খণ্ড' নামে লেখা হলেও অন্তিম অংশটির নাম শুধুই 'রাধাবিরহ', এই অংশটির শেষের পৃষ্ঠাগুলি পাওয়া যায়নি। পুঁথিটি খণ্ডিত বলে কাব্যরচনার সন-তারিখও জানা যায় না। কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র — কাহ্নাঞি, রাধা, বড়াঞি।

তবে আলোচ্য কাব্যটি সংস্কৃত কাব্য গীতগোবিন্দম্-এর ধরনে আখ্যানধর্মী ও সংলাপের আকারে রচিত বলে এতে প্রাচীন বাংলা নাটকের ('চিত্রনাটগীতি') একটি আভাস মেলে। মনে করা হয়, পূর্বতন লোকব্যবহারে অমার্জিত স্থূল রঙ্গরসের যে ধামালী গান প্রচলিত ছিল, তা থেকেই কবি এর আখ্যানভাগ সংগ্রহ করেছিলেন। কাব্যটিতে প্রাকৃত প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ পালাগান বা নাটের ঠাটে উপস্থাপিত। গ্রন্থটি স্থানে স্থানে আদিরসে জারিত ও গ্রাম্য অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হলেও আখ্যানভাগের বর্ণনানৈপুণ্য ও চরিত্রচিত্রণে মুন্সিয়ানা আধুনিক পাঠকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটিতে বেশ কয়েকবার উদ্ধৃত মর্মস্পর্শী একটি পদ —

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।

আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।

বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ বান্ধন।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।

দাসী হুআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।

তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে।

আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।

বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।"

গুরুত্ব

চর্যাপদের পর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আদি-মধ্য বাংলা ভাষার প্রাচীনতম আবিষ্কৃত নিদর্শন। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এর গুরুত্ব তাই অপরিসীম। অপরদিকে এটিই প্রথম বাংলায় রচিত কৃষ্ণকথা বিষয়ক কাব্য। মনে করা হয়, এই গ্রন্থের পথ ধরেই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলির পথ সুগম হয়; তবে এই কাব্যের ভাব বৈষ্ণব-মহান্তদের নির্দেশিত কৃষ্ণলীলার ভাবব্যঞ্জনার সঙ্গে মেলে না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন,

"জয়দেব ও ভারতচন্দ্রকে বাদ দিলে এ ধরণের কাব্য সমগ্র পূর্বভারতেই আর পাওয়া যাবে না।... বোধ হয় সেকালের শ্রোতারা এই পাঁচালি গানে বাস্তবতার সঙ্গে কিছু অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনাও লাভ করত। কিন্তু আধুনিক কালের পাঠক এ কাব্যের প্রত্যক্ষ আবরণ অধিকতর আনন্দের সঙ্গে আস্বাদন করবেন। রাধাকৃষ্ণলীলায় কিছু উত্তাপ ছিল, জয়দেবের গীতগোবিন্দে সেই উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, সে উত্তাপ 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতির পদেও কিছু স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করেছে। ভারতচন্দ্র সেই উত্তাপকে কামনার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে নর-নারীর প্রণয়চর্চাকে আলোকিত করেছেন। দেহের এই রহস্য চৈতন্য ও উত্তর-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে উত্তাপ হারিয়ে স্থির দীপশিখায় পরিণত হয়েছে।"

আবিষ্কার ও প্রকাশ

১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের বাসিন্দা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐ জেলারই বিষ্ণুপুর শহরের নিকটবর্তী কাকিল্যা গ্রামে জনৈক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে প্রথম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথি আবিষ্কার করেন। তার গোয়ালঘরের মাঁচায় এই পুথিটি তুলে রাখা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বনবিষ্ণুপুরের মল্লরাজগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রের বংশধর। পুথিটির সঙ্গে প্রাপ্ত চিরকুটটি থেকে জানা যায় যে আড়াই শত বছর আগে বিষ্ণুপুরের 'গাঁথাঘর' অর্থাৎ রাজগ্রন্থশালায় এটি রাখা ছিল।

আদ্যন্ত খণ্ডিত অবস্থায় প্রাপ্ত এই পুথিটি পাতলা তুলোট কাগজে হালকা কালিতে লিখিত এবং এতে তিন প্রকার লিপি দেখা যায় – প্রাচীন লিপি, প্রাচীন লিপির হুবহু অনুকরণ লিপি ও পরবর্তীকালের লিপি। কাব্যের ভাষাও যথেষ্ট প্রক্ষেপমণ্ডিত; বাঁকুড়া-মানভূম-ধলভূমের প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপভাষাগত শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। পুথির প্রথম দুটি পাতা, মাঝের কয়েকটি ও শেষ পাতাগুলি পাওয়া যায়নি। বর্তমানে ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুথিশালায় এটি রক্ষিত আছে। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শিরোনামে পুথিটি সম্পাদনা করেন এবং ঐ বছরেই উক্ত প্রতিষ্ঠান সেটি প্রকাশ করেন।নজনজপনরজ র। কলরলরল

নামকরণ

বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শিরোনামে গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করলেও, এই গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। প্রাচীন পুথিগুলিতে সচরাচর প্রথম বা শেষ পাতায় পুথির নাম লেখা থাকে। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির ক্ষেত্রে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ফলে পুথির নামও অজানাই থেকে যায়। এমনকি পরবর্তীকালের কোনও পুথিতেও বড়ু চণ্ডীদাস বা তার গ্রন্থের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাই নামকরণকালে পুথির কাহিনি বিচার করে লোকঐতিহ্যের অনুসারে এটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। তার বক্তব্য ছিল,

"পুথির আদ্যন্তহীন খণ্ডিতাংশে কবির দেশকালাদির কথা দূরে থাকুক, পুথির নাম পর্যন্তন পাওয়া যায় নাই। কথিত হয়, চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন। খেতরীর এক বার্ষিক উৎসবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গীত হইয়াছিল, অবশ্য কীর্তনাঙ্গে। আলোচ্য পুথির প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন, তাহাতে তর্কের অবসর নাই। অতএব গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামকরণ অসমীচীন নয়।"

গ্রন্থপ্রকাশের প্রায় ১১ বছর পর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রমেশ বসু সম্ভবত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের নামকরণকেন্দ্রিক

বিতর্কের সূত্রপাত ঘটান। এরপর বাংলা সাহিত্যের সারস্বত সমাজে এ-নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। যাঁরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণের বিরোধী ছিলেন, তাদের যুক্তি ছিল দ্বিমুখী। প্রথমত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' একটি আদিরসাত্মক অশ্লীল কাব্য – এতে শ্রী বা কীর্তন কোনওটিই উপস্থিত নেই। দ্বিতীয়ত, পুথির সঙ্গে যে চিরকূটটি পাওয়া যায়, তাতে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' বলে একটি কথা লিখিত আছে। অনেকে মনে করেন গ্রন্থের মূল নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। প্রথম যুক্তিটি আধুনিক কাব্যবিচারের দৃষ্টিতে খুবই দুর্বল; কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ দ্বিতীয় দাবিটি প্রসঙ্গেও যথেষ্ট সন্দিহান। এই কারণে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেছেন,

"যতদিন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ নাম আবিষ্কৃত না হচ্ছে ততদিন সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রদত্ত এই নামটিই স্বীকার করতে হবে।"

কাব্যে কৃষ্ণ শব্দের ব্যবহার নাই বললেই চলে, আছে কাহ্নাঞি শব্দ। সেই সূত্রে কাব্যের নাম "কাহ্নাঞিকীর্তন" করা যেতে পারে।

কবি বড়ুচণ্ডীদাস

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ুচণ্ডীদাস। যদিও তার আত্মপরিচয় বা জীবনকথা জাতীয় কিছু পাওয়া যায় না বলে তার প্রকৃত পরিচয় কিছুটা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। কাব্যে তার তিনটি ভণিতা পাওয়া যায় – 'বড়ুচণ্ডীদাস', 'চণ্ডীদাস' ও 'আনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস'। এর মধ্যে 'বড়ুচণ্ডীদাস' ভণিতা মিলেছে ২৯৮টি স্থানে ও 'চণ্ডীদাস' ভণিতা মিলেছে ১০৭ বার। ৭টি পদে ব্যবহৃত 'আনন্ত' শব্দটি প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করা হয়। ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা মনে করেন, চণ্ডীদাস তার নাম এবং বড়ু প্রকৃতপক্ষে তার কৌলিক উপাধি বাঁড়ুজ্যে বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপভ্রংশ। কবি চৈতন্যপূর্ববর্তীকালের মানুষ। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি জীবিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্যা এবং পদাবলির চণ্ডীদাসকে নিয়ে বাঁকুড়া ও বীরভূমের মধ্যে যত বিবাদই বিদ্যমান থাকুক না কেন, ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বড়ুচণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমাস্থ ছাতনার অধিবাসী ছিলেন। বড়ুচণ্ডীদাস বাসুলী দেবীর উপাসক ছিলেন এবং দেবীমন্দিরের নিকটবর্তী স্থানে তার 'চিত্রনাটগীতি' পরিবেশনের নাট্যশালা ছিল। এই বাসলী দেবী প্রকৃতপক্ষে শক্তিদেবী চণ্ডী অথবা মনসার অপর নাম। সম্ভবত বাসলী দেবীর বাৎসরিক পূজায় গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে কবি কর্তৃক এই কাব্য রচিত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবলম্বনে সমকালীন সমাজ বাস্তবতা ও সংস্কৃতি

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহিত্যে বিষয়বস্তুর উপকরণ, উপাদান হিসেবে সমকালীন সমাজ জীবন সাহিত্যে প্রোথিত হয়। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কাব্য, যে কাহিনী বহু আগ থেকেই বাংলায় নানা মূর্তিতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস এ কাহিনী নির্মাণে সম্পূর্ণত পুরাণকে আশ্রয় করেন নি বলেই কবি স্বাধীনভাবে বহু নতুন ঘটনা সন্নিবিষ্ট করায় সমকালীন সমাজের উপাদান চিত্রিত হয়েছে।

বাল্যবিবাহ যে তখনকার সামাজিক রীতি ছিল তা রাধার বাল্যবিবাহতে প্রমাণিত। গোপ কিশোরীর রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিচর্যার জন্য বৃদ্ধ রমণীকে নিয়োগ করা হত। উদ্ভিন্ন কিশোররি রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিচর্যার জন্য বৃদ্ধ রমণীকে নিয়োগ করা হত। বধূকে শাশুড়ি তখন সচরাচর বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে দিত না। বধূজীভন শাশুড়ি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাদের তেমন স্বাধীনতা ছিল না। বাড়ির যেতে শাশুড়ির অনুমতির প্রয়োজন হত। অপরাধ পেলে স্ত্রীকে স্বামী মারধর করত।

এ কাব্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী গোপ ছাড়াও তখনকার সমাজে কুমার, তেলী, নাপিত প্রভৃতি পেশাজীবির পরিচয় মেলে। তবে গবাদিপশু প্রতিপালন ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। নদীমাতৃক বাংলার গ্রাম্য সমাজের খেয়াপারের জন্য কিছু মানুষ মাঝিগিরি করত। নৌকা তৈরির জন্য মিস্ত্রি, করাতি ইত্যাদি পেশার মানুষ ছিল।

নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহবধূকেই গৃহের সকল কর্ম সম্পন্ন করতে হত। শাক-ঝোল-অম্বল ইত্যাদি ভালমন্দ রেঁধে বধূরা যত্নের সাথে স্বামী ও সংসারের সবাইকে খাওয়াত। জল আনতে দলবদ্ধভাবে মেয়েরা নদীতে যেত, নদীর জলই ছিল তাদের পানীয়। তখণ টিউবওয়েল ছিল না।

তখনকার গ্রাম্য সমাজে অশিক্ষিত নারী-পুরুষ পরস্পরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করত। তখনকার নারীদের কারণে, অকারণে শপথ করা ছিল তাদের স্বভাবধর্ম। কৃষ্ণকে বড়াই বলেছেন তার কথা যদি সে না শোনে তবে ব্রহ্ম হত্যার পাতক হবে। তাদের মনে এ বিশ্বাস ছিল যে, ভগবানের বিচারে পাপীর দণ্ড ও পুণ্যবানের পুরষ্কার আছে।

"পুণ্য কইলেঁ স্বগগ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ

পাঁপে হএ নরকের ফল।"

অভীষ্ট সিদ্ধির আকাঙ্খায় তখন দেবতার দরবারে পূজা ও দান করার প্রথা ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, সুতীর্থে তপস্যা করলে বা স্নান করলে প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়্ নদীপথে বিপদগ্রস্থ হলে নদী ও পবনকে মানত দিত।

মন্ত্রতন্ত্রেও লোকের বিশ্বাস ছিল। মূর্ছিতা রাধাকে ঝাড়ফুঁকের দ্বারা জাগ্রত করা হয়। বড়াই বাণ মেরে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়ায়, সেই অবকাশে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে। স্বকৃত পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্তের বিধান সমাজে প্রচলিত ছিল।

"ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ,

সব মোর করমের ফল, পুরুব জনমে

কৈল করমের ফল।"

- ইত্যাদি উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, কবির সমকালে বাঙালি জন্মান্তর, কর্মফল ও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিল। তখনকার সমাজে শক্তিদেবী চণ্ডী বিশেষভাবে পূজিত হত। তখনকার লোক বেশিরভাগই শাক্ত ছিল। রাধাকে বড়াই বলেছে- যত্নসহকারে চণ্ডকে পূজা করে সন্তুষ্ট করতে পারলেই কৃষ্ণের সন্ধান মেলবে।

সমাজে নারীর বিশ্বাস- স্বামী যাকে উপভোগ করে সেই রমণীই সতী। পরপুরুষের সংসর্গে কুল নাশ হয়।

সমাজের উচু বংশের মানুষের স্বভাব আচার-আরচণ ছিল মহৎ। নিচু বংশীয়দের আাচার ছিল নিচু। পেশার ভিত্তিতে সে সমাজে মানুষের সম্মান নির্ভর করত। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল, যা ভারতবাহী মজুর কৃষ্ণ ও মালিক রাধার কথাবার্তায় বুঝা যায়। তাছাড়া দরিদ্র মানুষ ধনী মানুষের মেয়েকে বিয়ের সুযোগ পেত না। তখনকার সমাজে বিশেষত নারীদের মদ্যে কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। বাড়ির বাইরে যেতে বাধা পেলে, টিকটিকি ডাকলে, হাঁচি আসলে, তেলিকে তেলি নিয়ে যেতে দেখলে, ডানের শেয়াল বামে গেলে, শুকনা যালে কাক ডাকলে, ভাঙা পাখায় বাতাস দিলে, দাঁত দিয়ে কূটা কাটলে সমূহ অমঙ্গল হয়। অযাত্রা, কুযাত্রা সম্পর্কে এমনি সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ছিল তাদের।

স্ত্রীলোকেরা সচরাচর না পরলেও বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কণ্ঠে গজমুক্তার হার, কানে রতন, কুণ্ডল, বাহুতে আঙ্গদ বা কনক যূথিকামালা, কটিদেশে কনককিঙ্কিণী, করাঙ্গুলিতে আঙ্গুঠী, পদাঙ্কগুলিতে পাসালী ইত্যাদি অলঙ্কার ব্যবহার করত।

সমাজে চোর ছিল, ছিল দস্যু-ডাকাত। কড়ির বিনিময়ে যে কোন কাজের জন্য শ্রমিক/কুলি পাওয়া যেত। নদী পারাপারে কড়ির প্রচলন ছিল। খেয়াঘাটে বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইজারাদারির প্রথা ছিল। সমাজে শক্তিশালীদের হাতে দুর্বলেরা নিগৃহীত, অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হত। কংস রাজার অত্যাচারের অনুষঙ্গে রাজ্যের জনগণের প্রতি রাজার অত্যাচারের বিষয়টি স্পষ্ট। রাজকর আদায়ের রীতি ছিল। হাটে-খেয়াঘাটে ও পথে শুষ্ক আদায়ের প্রচলন ছিল। হিসাবনিকাশ কড়ি দিয়ে করা হত। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারে রাজার কাছে নালিশের রেওয়াজ ছিল। কোন কিছুর বিনিময়ে বন্ধকী প্রথ ছিল। নারী হত্যা তখন সর্বাধিক নিন্দনীয় পাপকর্ম বলে বিবেচতি হত। শতখানেক ব্রহ্ম হত্যাতে যে পাপ এক নারী হত্যাতে সমান পাপ হত।

তখনকার সমাজে বিয়েশাদির প্রস্তাব ঘটকের মাধ্যমে ফুল-পান-সন্দেশ নেতবস্ত্র সহযোগে পৌঁছাবার রীতি ছিল। পাড়া-প্রতিবেশী বেড়াতে গেলে তাকে পান-তামাক দিয়ে আতিথেয়তা করত। বিবাহিত নারীর পরপরুষে প্রেম সমাজে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হত। সাল, তারিখ গণনার জন্য পঞ্জিকার প্রচলন ছিল।

কৃষ্ণের লাম্পট্যের মাধ্যমে সমাজের প্রাকৃত জীবন শত শত লাম্পট্যের জাল বিস্তার ও গ্রাম্য সরলা বাহু নারীর প্রণয়বঞ্চিত জীবনের দুর্দশা ও বেদনা শিল্পী চিত্রিত করেছেন। তৎকালীন সমাজে সুবিধামত সময়ে মানুষের প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল। রাধার প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের মাধ্যমে বিয়টি ধরা পড়ে-

(ক) আম্মাকে বল কৈলে তোর নাহি কিছু ফল

মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল।

(খ) আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।

(গ) মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।

(ঘ) যে ডালে করো যো ভরে সে ডাল ভঙ্গিল পড়ে।

(ঙ) সোনা ভাঙিলেআছে উপায় জড়িএ আগুন তাপে

পুরুষ নেহা ভাঙিলে জুড়িএ কাহার বাপে।

রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্য হওয়া সত্ত্বেও ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ হতে আমরা তৎকালীন সমাজের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র পাই তা পমিাণে বেশি না হলৌ তার মূল্য কম নয়। এরই মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালি মনের ছাপটি নিঃসন্ধিগ্ধভাবে অনুভব করা যয়। মধ্যযুগের কাব্য সমাজের চালচিত্র তুলে ধরার অভীষ্টে রচিত না হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই বাঙালি ভাবচেতনা ও জীবনরস বোধের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বলা যায়।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট